এই সংখ্যায় ভিতরের পাতায়
√ ২০ মাইক্রনের ধোঁকা
√ খেলতে খেলতে অঙ্ক
√ যারা হারিয়ে যাচ্ছে
√ বিকল্প শক্তির সন্ধানে বায়োগ্যাস √ কৌতূহল

বিজ্ঞান অন্বেষক

New Dynamic Engineers' Co-Society Ltd.
Govt. Contractors
(Civil, Mech. & Elect.)
6, Chandmari Road, Kanchrapara

বর্ষ -১ তৃতীয় সংখ্যা নভেম্বর - ডিসেম্বর /২০০৩ দাম ১টাকা

আবহাওয়ার খোঁজ খবর

বৃষ্টিতে ভেসে গেছে এবার গোটা পূর্বভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ। আবহাওয়া অফিস বৃষ্টি আর হবে না বলবার পরেই তেড়ে বৃষ্টি নেমেছে অথবা বৃষ্টি হতে পারে বলবার পরে পরেই উঠেছে ঝলমলে রোদ— এমন ঘটনা ঘনঘনই ঘটছে। সাধারণ মানুষ যাই বলুন, পূর্বাভাষের অমিল কিন্তু কোনও মতেই আবহাওয়া দপ্তরের অকর্মণ্যতা প্রমান করে না। কারণ আবহাওয়া খুব ঘনঘনই পরিবর্তিত হয়। নিম্নচাপের অঞ্চল খুব অল্প সময়েই দিক পরিবর্তন করে। যাই হোক, আবহাওয়া অফিসের সাফাই গাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা নয়। পৃথিবীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভীষণ দূষণ : সেই যে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল, তার পরে গোটা পৃথিবীই শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। শেষ দুই শতাব্দী অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ে গোটা পৃথিবীতেই কলকারখানা বেড়েছে অকল্পনীয় হারে। এর সবটাই যে মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্যে গড়ে উঠেছে তা নয়। কিছু কিছু কারখানা মানুষ মারার মারণাস্ত্র তৈরির কাজেই নিবেদিত প্রাণ। এই শিল্পায়নের পরিণতিতে গোটা পৃথিবী জুড়েই দূষণ বেড়েছে প্রভূত পরিমাণে। সেই দূষণ পৃথিবীর আবহাওয়াতে নিয়ে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। মানুষ তথা জীবজগতের বেঁচে থাকবার জন্য যা যা উপকরণ প্রয়োজন, যেমন— ভূমি, পরিষ্কার জল, সূর্য এবং মহাজাগতিক বিকিরণ (হ্যাঁ, মহাজাগতিক রশ্মি ক্ষতিকারক বলা হলেও প্রকৃতি ও তীব্রতা বা intensity বিচার করে তারও প্রয়োজনীয়তা আছে)। সবকিছুকেই মানুষের ব্যবহারের অযোগ্যতার স্তরে নিয়ে যাচ্ছে ঐ দূষণ। নষ্ট হচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া এবং পরিবেশ।

মডেল বানানো : যে কোনও শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হলে তাকে বিশেষভাবে জানা একান্তই প্রয়োজন। এজন্য মানুষকে আকাশে বা মহাশূন্যে গুপ্তচর পাঠাতে হয়েছে বা হচ্ছে। LIDAR অথবা Light Detection and Ranging-এর সাহায্যে কোথাও কোথাও মাটির ওপরে নয় থেকে এগারো কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে ঘোরাফেরা করা মেঘদূতদের হালচাল জানা যাচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়েই আবহাওয়া ও পরিবেশগত পরিবর্তনের খবর জানবার এবং তার একটা মডেল বানাবার চেষ্টা চলছে। এই জন্য বিশেষভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে ইলেকট্রনিক এবং আলোক প্রযুক্তিকে। যেসমস্ত Sensor ব্যবহার করা হচ্ছে, তার কোনওটা মহাকাশে, কোনওটা বাতাসে ভাসমান, আবার কোনওটার শেকড় এই মাটির পৃথিবীতেই রয়েছে। এর কোনওটা অত্যন্ত সক্রিয়, কোনওটা আবার সেই অর্থে সক্রিয় নয়—বরং নিষ্ক্রিয় (১)। এই সেন্সর বা মেঘদূত, পবনদূতও

এর পর ২ পাতায়

পাখিদের কথা

পায়রা গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে হরিয়াল বেশ স্ফূর্তিবাজ পাখি। সবসময়ই এরা চনমনে, যেন ম্যারাথন্ উড়ানের জন্য প্রস্তুত। সবুজ গাছের মগডালে, যেখান থেকে পৃথিবীকে ঠিক ছবির মত দেখায়, সেখানে এদের আনাগোনা। তারুণ্য ও একতার প্রতীক এরা। নির্দয় পৃথিবীর মানুষ এদের হত্যা করে আসছে মাংস খাওয়ার লোভে। আমি চাই লোলুপ দৃষ্টিতে নয়, প্রশান্ত দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্যই মানুষ তাকিয়ে থাকুক হরিয়ালের দিকে।

হরিয়াল : বাংলায় সবুজ পায়রা বা হরিয়াল নামে এবং ইংরাজিতে *Common Green Pigeon* নামে এরা পরিচিত। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Treron phoenicoptera*। এদের ঠোঁট, পা, দেহগঠন হুবহু গোলা পায়রার মত তবে দেহের

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

জলবসন্তে

মাছ-মাংস ডিম খাওয়া

বিশ্বাস : হাম, জলবসন্ত ও গুটি বসন্ত আসলে 'মায়ের দয়া'। শীতলা পুজো করলেই সেরে যাবে। ঝাড়ফুঁক-তুকতাক করলে এবং জলপড়া খেলেই সেরে যাবে। নিমপাতা ব্যবহার ও নিরামিষ আহারও করতে হবে।

বিজ্ঞান : হাম, জলবসন্ত ও

এরপর ৬ পাতায়

ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়

১৯৮৪ সালের ২-৩ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল শহরে ইউনিয়ন কার্বাইড (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (কার্বামেট বা সেভিন জাতীয় কীটনাশক উৎপাদনকারী কারখানা) থেকে মিথাইল আইসোসায়ানেট (মিক) জাতীয় মারণাগ্যাস লিক হয়েছিল। হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ভোপাল মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছিল। সমগ্র ভোপাল ও আশপাশের পরিবেশে বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

১৯৮৪ থেকে ২০০৩ দীর্ঘ ১৯ বছরে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক শিল্প দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ২০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। ১,৫০,০০০ এর বেশি মানুষ নানা ধরণের রোগে (শ্বাসকষ্ট, অনিয়মিত জ্বর, কাশি, স্নায়ুজনিত রোগ, দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা, অবসাদ,

এর পর ৪ পাতায়

দন্ত রোগের অন্ত

যেকোনও রোগ প্রতিহত করার দুটো উপায় আছে—রোগ শুরুর আগেই প্রতিরোধ এবং রোগের প্রতিবিধান। দাঁতকে রোগমুক্ত রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল প্রতিরোধ। তাই দন্তরোগের প্রধান চিকিৎসক রোগী স্বয়ং।

একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে দাঁতের সমস্যা বেড়েই

এরপর ৫ এর পাতায়

আবহাওয়া

১ পাতার পর

হংসদূতেরা যে সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে তার বিস্তৃতি অবলোহিত থেকে দৃশ্যমান ও অতিবেগুনী হয়ে একেবারে মাইক্রোওয়েভ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। আমি বহু কষ্ট করেও হেলে সাপই ধরতে পারিনি কখনও, কেউটে, গোখরো তো দূর অস্ত। তাই সব ছেড়ে দিয়ে Satellite-এর সঙ্গে লাগানো সেন্সর নিয়ে একটু আবোল তাবোল বকে যাই।

ইওএস : স্বীকার করি আর না-ই করি, যতই চাঁদেই পা দিই আর মহাকাশে পায়চারি করি না কেন, আসলে আমরা 'ন্যাংটা মায়ের ন্যাংটা ব্যাটা' অর্থাৎ মাটির মানুষ। তাই আকাশে যতই স্যাটেলাইট-এর পায়রা ওড়াই না কেন, আমাদের সব কারিকুরি ভূপৃষ্ঠে। সুতরাং Earth Observing System বা সংক্ষেপে EOS-এ বসেই রোবার দি কন্‌কারারের পাঠানো সমস্ত তথ্য জমা করে বিশ্লেষণ না করে পারি না। EOS-এর তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থা রয়েছে। Satellite থেকে পাওয়া সংবাদ প্রথমেই EOSDIS (EOS Data and Information System)-এর Internal নেটওয়ার্কে পৌঁছায়; তারপরে System Management Centre হয়ে পৌঁছে যায় EOSDIS-এর External নেটওয়ার্কে। সেখান থেকে সংবাদ পৌঁছে যায় স্বীকৃত তথ্যকেন্দ্রে এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীর কাছে, যার মধ্যে User Science Computing Facility কেন্দ্রও থাকে। বছর ছয়-সাত আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের EOS-এর ছিল আটটি অংশ, যেগুলো পুরো উত্তর আমেরিকাতে ছড়িয়ে ছিল। এরমধ্যে ছিল তাদের (১) জাতীয় ঝড় ও তুষারপাত সংবাদ কেন্দ্র; (২) EROS(Earth Resource Observation System) সংবাদ কেন্দ্র, যা মাটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে কাজে লাগে; (৩) আলাস্কায় ছিল সমুদ্রে জমা বরফ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ কেন্দ্র; (৪) Oak Ridge জাতীয় পরীক্ষাগার, যা Bio-Geo-Chemical অর্থাৎ জৈব-ভৌগলিক-রাসায়নিক সংবাদ সংগ্রহ করছিল, (৫) ছিল বায়ুমণ্ডলের ওপরের এবং পৃথিবীর সঙ্গে লেগে থাকা বায়ু মণ্ডলের সংবাদ সংগ্রহ কেন্দ্র; (৬) ছিল বিকিরণ মাত্রা, আগ্নেয় লাভা এবং ঘনমণ্ডল বা troposphere-এর রসায়ন সম্পর্কিত সংবাদ-গ্রাহক কেন্দ্র; (৭) ছিল সমুদ্রের হালচাল এবং সমুদ্র ও বাতাসের মিত্রতা-শত্রুতার খবর ধরে ফেলার গবেষণাগার। সেই সঙ্গে ছিল Marshal Space Plight Centre.

এই বিপুল পরিমাণ সংবাদ হয়ে দাঁড়ায় সুপার কম্প্যুটারের খাদ্য। এইসব সংবাদের মধ্য থেকে প্রথমে প্রয়োজনীয় সংবাদকে ছেঁকে নেওয়া হয়। তখন সেই সংবাদ তথ্যে পরিণত হয়। ঐ রাশিকৃত তথ্য ব্যবহার করে সুপার কম্প্যুটার পৃথিবীর আগামী পাঁচশো বছরের আবহাওয়া ও পরিবেশের সম্ভাব্য অবস্থা সম্পর্কে আগাম জানান দিতে পারে। এমন কি আঞ্চলিক স্তরেও এই আগাম জানান দেওয়া সম্ভব। এখানে একটা ব্যাপার বলা প্রয়োজন: গত দুশো বা একশো বা পঞ্চাশ বছরের শিল্পায়ন, জনসংখ্যা, যুদ্ধে মারণাস্ত্র ব্যবহার ইত্যাদির বৃদ্ধির হার জেনে নিয়ে আগামী শতকগুলোতে ঐগুলো কোথায় পৌঁছতে পারে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে এবং এসবের প্রভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন কতখানি হতে পারে তারও আঁচ পাওয়া যাবে। তবে এটা সম্পূর্ণ মিলে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ এর মধ্যে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে যায়, তাহলে একদিকে যেমন জনসংখ্যা, কলকারখানা কমে যাবে, অন্যদিকে পারমানবিক বিকিরণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাবে। ঐ ভবিষ্যৎবাণী মোটামুটিভাবে যেমন চলেছে, তেমন চলবে ভেবে নিয়েই করা যেতে পারে।

কথা ছিল এই শতাব্দী শেষ হবার মধ্যেই বা পরেপরেই মোট পঞ্চাশটা Satellite পৃথিবীর চারপাশে স্থাপন করা হবে। ঐ পঞ্চাশটি Satellite-ই হবে আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহে নিবেদিত প্রাণ। EOS সম্পর্কে অবশ্য কেউ কেউ এখনই বলছেন যে, EOS দীর্ঘমেয়াদী আবহাওয়া অনুসন্ধানে সক্ষম নয়। কিন্তু অনেক গবেষক আশাবাদী যে EOS-ই ভবিষ্যতের আবহাওয়া-সংবাদ পরিবেশনের পদ্ধতি কি হবে, তা বলে দেবে।

Albedo ভরসা : EOS যে বিষয়গুলোকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়, সেগুলো হল আবহাওয়ার ওপরে মেঘ, জলীয় বাষ্প, অধঃক্ষেপ (precipitation) এবং সূর্যের বিকিরণের প্রভাব। সন্দেহ নেই সূর্যের বিকিরণ ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। কারণ সূর্যের বিকিরণ যতটা পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে তার কতটা পৃথিবী মহাশূন্যে ফেরৎ পাঠাতে পারছে তার ওপরে এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্যের বিকিরণের তারতম্যের ওপরে পৃথিবীর আবহাওয়া অনেকটাই নির্ভরশীল। সুপার কম্প্যুটার যে মডেলই বানাতে যাক, দীর্ঘমেয়াদী আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং গ্রীনহাউজিং-এর ফল মিলেমিশে আজকের আবহাওয়াকে সামান্য সময় পরেই পাঁচশো গুণ পাল্টেদিতে পারে। এর জন্য সেই মেঘদূতেরা অর্থাৎ মেঘই সবচেয়ে বেশি দায়ী। আর ঐ মেঘদূতকে কালিদাস কতটা চিনেছিলেন জানি না, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদেরা অতি সামান্যই চিনতে পেরেছেন। মেঘ গ্রীনহাউজিং-এ যে কিভাবে কতটা প্রভাব বিস্তার করে, তা খুবই জটিল এবং অনেকটাই দুর্বোধ্য। কম উচ্চতায় মেঘ বায়ুমণ্ডলকে ঠাণ্ডা করে। কারণ ঐ ক্ষেত্রে মেঘ সূর্যের বিকিরণকে প্রতিফলিত করে মহাশূন্যেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু বেশি উচ্চতার মেঘ বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। কারণ ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপ সেই মেঘ শোষণ করে। এই ঠাণ্ডা করবার ঘটনাকে দেওয়া হয়েছে Albedo effect নাম। কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা প্রতিমুহূর্তে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করে আমরা পৃথিবীর বাতাসকে দূষিত করে চলেছি, পৃথিবীর বাতাসকে গরম করে। অন্যদিকে Albedo effect পৃথিবীর বাতাসকে করে ঠাণ্ডা। Albedo effect কিন্তু আমাদের বন্ধু। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যদি শিল্পবিপ্লবের আগে যা ছিল তার দ্বিগুণ হয়ে যায়, তখনও Albedo effect সেই গরম হবার সম্ভাবনার প্রায় সাতগুণ থেকে যাবে। অতএব 'নাহি ভয়'।

কার্বন ডাই-অক্সাইড : কিন্তু বাতাসে যে অধঃক্ষেপ পড়ে বা তলানি জমা হয়, সেটা বেশ আতঙ্কের। আবার মেঘ হচ্ছে সেই অধঃক্ষেপের অগ্রদূত। এই অধঃক্ষেপের পরিমাণ বাড়লে-কমলে তা আবহাওয়ায় পরিবর্তন এনে দিতে পারে। কিন্তু জটা থাকলেই যেমন উকুন সেখানে বাসা বাধে, তেমনি পাথিব ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে মেঘ, জলীয় বাষ্প এবং অধঃক্ষেপ। এর সঙ্গে আমরা যোগ করে যাচ্ছি কার্বন ডাই-অক্সাইড। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সামনাসামনি এলে এরা যুদ্ধও করতে পারে, সন্ধিও করতে

এরপর ৩ পাতায়

মুখস্ত বিদ্যা নয়। পরীক্ষা হলে ইংরাজী বানিয়ে লিখে ভাল ফল করুন।
ভর্তি চলিতেছে—IX - XII & Degree.
যোগাযোগ - T. PAUL
"কুসুম কুটীর", কাঁচরাপাড়া
পলিটেকনিক বয়েজ স্কুলের দক্ষিণে।
ফোন : ২৫৮৮-০৮২১

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

আবহাওয়া

২ পাতার পর

পারে। যুদ্ধের ফলের মতই সন্ধিসুত্রও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এখন এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাতাসে কিভাবে বাড়ছে দেখা যাক : (১) শিল্প বিপ্লবের আগে ছিল—প্রতি দশ লক্ষ ভাগে দুশো সত্তর ভাগ, (২) এখন রয়েছে—প্রতি দশ লক্ষ ভাগে প্রায় পৌনে চারশো ভাগ, (৩) পঞ্চাশ বছর পরে হবে— প্রতি দশ লক্ষ ভাগে প্রায় সাড়ে পাঁচশো ভাগ। অর্থাৎ আমরা শিল্প বিপ্লবের আগের সময়ের প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলেছি কার্বন ডাই-অক্সাইড। সুপার কম্প্যুটার মডেল বলছে, এরফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। অবশ্য অগ্ন্যুৎপাতে এবং অপরিশোধিত কয়লা পোড়াবার ফলে সালফারের অক্সাইড তৈরি হয়েছে, হচ্ছে বা হবে। সেই সালফার অক্সাইড বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে অ্যাসিড তৈরি করবে, যে বিক্রিয়া তাপশোষক। ফলে তাপমাত্রার সম্ভাব্য বৃদ্ধি অতটা হবে না। অবশ্য অ্যাসিড বৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। মানে, বাড়বে আর এক গেরো।

পৃথিবী শুকিয়ে যায় : কদিন আগেও বাষ্পীভবন হত মুখ্যত মহাসাগর থেকে। কিন্তু কিছুকাল হল প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও প্রচুর বাষ্পীভবন শুরু হয়েছে। কারণ আমরা নানাভাবে পৃথিবীকে গরম করে যাচ্ছি। যদি এভাবে গরম করা হয় তাহলে ধীরে ধীরে পৃথিবী শুকিয়ে যেতে থাকবে—এমন কথা অনেকেই বলছেন। তা যদি ঘটে, তাহলে আগে শুকিয়ে যেতে শুরু করবে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো। যেগুলোর ধারে কাছে মহাসাগর নেই, সাগর নেই, নেই কোনও বড় নদী। এর ফলে বৃষ্টি কমে যাবে। বৃষ্টি কমলে কমবে জল। আর জল কমলেই বাষ্পীভবন হবে কম, যার ফলে বৃষ্টি আরও কমে যাবে। অর্থাৎ ক্রমেই বৃষ্টি কমবে, শুকোতে থাকবে ভূপৃষ্ঠের জল।

জলবিজ্ঞানের প্রয়োজনে সে জন্যই পৃথিবীর চারপাশে নানা ধরনের Sensor বা সংবেদক বসানো হয়েছে জলীয় বাষ্প, অধঃক্ষেপ, মেঘে জলের পরিমান, তাপমাত্রা ইত্যাদির প্রতি মুহূর্তের খবর সংগ্রহের জন্য।

অবলোহিত এবং মাইক্রোওয়েভ দিয়ে দূর থেকে বোঝা ব্যাপারটা Spectroscopy- রই একটি পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের অণুগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। ঐ অণুগুলো বিকিরণকে শুষে নিতে পারে, ছড়িয়ে দিতে পারে। কোনও Frequency band হয়তো বেশি শুষে নেয়, কোনওটা শুষে নেয় কম। একইভাবে কোনও band কম ছড়িয়ে দিলেও কোন কোন band বেশি ছড়িয়ে দেয়। মাইক্রোওয়েভ bandএর গ্রাহক বায়ু মণ্ডল অর্থাৎ আবহাওয়া সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এইভাবে। বর্তমানে যেসব অবলোহিত গ্রাহক রয়েছে সেসব যন্ত্র ঘনমণ্ডল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে মাইক্রোওয়েভ গ্রাহকের দ্বিগুণ পরিমাণে। আবার মাইক্রোওয়েভ গ্রাহক মেঘের কালো রং ভেদ করে, অধঃক্ষেপের ব্যূহ ভেদ করে সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে পারে। ঐ কাজ কিন্তু অবলোহিত গ্রাহক পারে না। সে জন্য অবলোহিত ও মাইক্রোওয়েভ গ্রাহক একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

আবহাওয়া গতিপ্রকৃতি জানতে গিয়ে প্রধানত জল আর অক্সিজেন অনু ২২ ও ৬০ জিগাহার্টজ (এক জিগা হার্টজ মানে দশ কোটি হার্টজ) কম্পাংক ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়।

তরুণ কুমার দে - ২৫৮৭ ১৭৩৯

পাখি : হরিয়াল

১ পাতার পর

আকার বেশ মজবুত। ঠোঁটের রঙ ছাই-সাদা-সবুজ মিশ্রণ। গলা, বুক, পেট ও পিঠ হলদে আভা যুক্ত জলপাই সবুজ রঙা, মাথা ও ডানার সামনের দিকটা ছাই-ধূসর রঙের। পুরুষ হরিয়ালদের ঘাড় ও ডানায় হালকা গোলাপী রঙের আভা লক্ষ্য করা যায় যেটা স্ত্রী হরিয়ালদের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। ভারতীয় পায়রা দলভূক্ত হলেও বাসন্তী-হলুদ রঙা পা এর জন্য এরা একটু আলাদা ভাবে পরিচিত। গ্রাম-শহরের বনাঞ্চলে গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে ডালে এরা দলবদ্ধ ভাবে চলাফেরা করে। একটি বা দুটি হরিয়াল মনপছন্দ গাছে বসে পড়লে দলের অন্যেরা এক-আধ পাক দিয়ে ঐ গাছের ডালে সার-সার দিয়ে বসে পড়ে। পাতার রঙের সঙ্গে দেহের সবুজ রঙ সহজে মিলেমিশে যায় বলে গাছের তলা থেকে এদের হদিস পাওয়া একটু কঠিন, নড়াচড়া নজরে এলে তখন বোঝা যায়। অনুন্নত গ্রামের প্রায় সবজায়গায় এবং নির্জন হাইরোডের ধারে ধারে বটজাতীয় উঁচু ডালে এদের দেখতে পাওয়া যাবে তা আশা করা যায়। ভোর বেলা ও বিকেল বেলা কমপাতা বিশিষ্ট উঁচু তলার ডালে সার বেঁধে রোদ পোহানো এদের নিয়মিত কাজ। এরা নিজেদের মধ্যে খুব একটা ঝগড়া করে না বরং উঁচু নিচু কণ্ঠস্বরে সুরেলা শিষধ্বনির মত ডাকাডাকিতে মগ্ন থাকে। সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে এরা হঠাৎ পাতার রঙে মিশে স্ট্যাচু হয়ে থাকে কিছুক্ষণ এবং বিপদ বুঝলে একসাথে দুরন্ত গতিতে সোজাসুজি অন্যত্র পাড়ি দেয়। ওড়বার সময় এদের ডানা থেকে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এরা সম্পূর্ণরূপে ফলাহারী; সারাদিন এরা বট্, অশ্বত্থ, ডুমুর জাতীয় গাছে খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। কাঁচের গুলির মত বড় পাকা ফল না ভেঙে এরা অনায়াসে গিলে ফেলতে পারে। জনবসতিপূর্ণ এলাকা বা হৈ হট্টগোল পূর্ণ অঞ্চল এরা এড়িয়ে চলে; নির্জনতাই এদের প্রিয় তবে পাকা ফলের লোভে ঝাঁকবেধে সময় সময় শহরের বাগানের দিকে চলে আসে। মাঝারি উচ্চতার গাছের ডাল পাতার আড়ালে কাঠিকুটি দিয়ে মানুষের হাতের তালুর মত বাসা বানায় এবং ঘুঘু-পায়রাদের মত এরাও ঝক্‌ঝকে সাদা ২টি ডিম পাড়ে।

হরিয়াল

বর্তমানে এরা বিলুপ্তপ্রায় পাখিদের পর্যায়ে পড়ে। এদের বিলুপ্তির পিছনে কয়েকটি কারণ আছে তা হল— ১) আগের মত এখনও 'হরিয়াল' নামটা পরিচিত এর সুস্বাদু (!) মাংসের কারণে কখনোই এর সৌন্দর্য্যের জন্য নয়। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত পাখি শিকারীরা অগুণতি হরিয়ালকে হয় ফাঁদে ফেলে নতুবা গুলি করে মেরে রসনা তৃপ্ত করেছে। ২) শহর এগিয়ে আসছে বনের দিকে; বড় বড় গাছ কাটার ফলে এদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা -২৬৮৪ ৫৫৫৪

ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়

১ পাতার পর

অনিয়মিত ঋতুস্রাব, জীনগত পরিবর্তন সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগ) ভুগছেন। কোনওরকম ওষুধ বা ডাক্তারী পরিষেবাও পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনই গড়ে গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ১ জন করে মানুষ মারা যাচ্ছেন। ১৯৮৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এক রায়ে মাত্র ৪৭ কোটি ডলার ত্রাণ দানের বিনিময়ে ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীকে ১৯৮৪ সালের ভোপালের জনগণকে হত্যা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিকলাঙ্গ ও নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টির দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দিয়েছে। ভোপাল জেলা আদালতে মূল মামলার শুনানী ছাড়াই সুপ্রীম কোর্টের মতো ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষে এই রায় দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ভোপালের জনগণের কাছে এক ধরনের চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ভোপালের জনগণের ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ পাবার দাবিটিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। গ্যাসে আক্রান্তদের বিভিন্ন সংগঠন- ভোপাল গ্যাস পীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন, গ্যাস পীড়িত স্টেশনারী কর্মচারী সংঘ, জহরিলি গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা ও ভোপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন এন্ড অ্যাকশন সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞান পরিবেশ ও নাগরিক সংগঠনগুলি এই রায় বাতিলের দাবিতে ও পাশাপাশি ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। গ্যাস বিপর্যয়ে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ টাকার অঙ্কে মাত্র ১৪৭৩ কোটি টাকা। সুপ্রীমকোর্টের মতে নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ধার্য ছিল জনপ্রতি ২ থেকে ৪ লাখ টাকা, অথচ ভোপালে ২০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল যাদের জন্য জনপ্রতি মাত্র ৮৯,৩০০ টাকা ধরা হয়েছে। সারাবছরের জন্য অক্ষমদের জনপ্রতি ক্ষতিপূরণ ধরা হয়েছে মাত্র ২৬,৫৪০ টাকা। সব মিলিয়ে ইউনিয়ন কার্বাইডকে যাবতীয় দায় থেকে মুক্ত রাখার সবরকম চেষ্টাই ভারত সরকার চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০২ সালের ২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এর চেয়ারম্যান ড: দিলীপ বিশ্বাস মধ্যপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে ৫ দফা নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য সুপারিশ করেন, যার প্রতিটি নির্দেশই ইউনিয়ন কার্বাইডকে কেন্দ্র করে। নির্দেশ গুলি হল— (ক) পুকুর, জলাশয় বা ডোবাগুলিকে (ভোপাল ও তার আশপাশের) যাতে ব্যবহারযোগ্য করা যায় তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমে থাকা কীটনাশক, বিষাক্ত আবর্জনাগুলি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে যাতে ঐসব অঞ্চলের লোকেরা নিরাপদে বসবাস করতে পারেন। (গ) কোম্পানীর/কারখানার ভিতরে বিষাক্ত আবর্জনাগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে। (ঘ) ভূগর্ভস্থ জলে ও শস্য ক্ষেত্রে বিষাক্ত কীটনাশক ও দূষণ যাতে না ছড়াতে পারে তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। (ঙ) দূষিত জল, দূষিত এলাকাগুলি চিহ্নিত করতে হবে যাতে মানুষ, পশু ও কৃষিজাত পণ্য দূষণ থেকে বাঁচতে পারে।

যেহেতু ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানী থেকে মিক গ্যাস লিক হয়েছিল এবং কোম্পানীতে কোনওরকম দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ছিল না, সেহেতু সবরকম ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব ইউনিয়ন কার্বাইডকেই নিতে হবে।

ভোপাল গ্যাস বিপর্যয় এর পরে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে যায়। সর্বোচ্চ গবেষণা সংস্থা, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সি এস আই আর) এর বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে 'মিক' মারণ গ্যাসের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেন। পরে অবশ্য ফসজিন্ (মারণ গ্যাস, গ্যাসচেম্বারে হিটলার যে গ্যাস ব্যবহার করে ইহুদিদের হত্যা করেছিলেন) গ্যাসের উপস্থিতিও স্বীকার করে নেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশ্নে প্রতিটি শিল্পকারখানার দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ঠিকমত কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা সরকারকে সঠিকভাবে জানাতে হবে। গবেষণা সংস্থাগুলি সঠিকভাবে প্রতিটি শিল্পে দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার কথা সরকারকে জানাবেন। (যেমন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ছাই সমস্যাটি সমাধানের জন্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর যন্ত্র খুবই কার্যকরী। এছাড়াও আছে মেকানিক্যাল ডাস্ট কালেক্টর)।

১৯৮৪ সালে ২-৩ ডিসেম্বর ভোপালের ইউনিয়ন কার্বাইডে মিক গ্যাস লিক হবার আগেও ঐ কারখানায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কারখানার শ্রমিকরা নিরাপত্তার প্রশ্নটি বহুবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ছিলেন। ভারত সরকারের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী লোকসভায় জানিয়েছিলেন ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গলদ নেই। অথচ একথা আজ পরিষ্কার যে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় কোনওরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ছিল না এবং বেআইনীভাবে মিক গ্যাস মজুত ছিল, যা লিক হয়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ও বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন। মতামত ও পরামর্শ অবশ্যই পাঠাবেন।

H.P. GAS
(A Govt. of India Enterprise)
your friendly gas
By Hindustan Petroleum Corpn. Ltd.
Distributor
KANCHRAPARA
H.P. GAS SERVICE
30, Rajani Babu Rd.,
Kanchrapara
Ph: 2585-5221
(New Connection available here Rs. 1850 only, including Oven, Accessories & Insurence)

দন্ত রোগের অন্ত

১ পাতার পর

চলেছে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে। এবং এটাও লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এখন দাঁতের সমস্যা প্রধানত নগরভিত্তিক। যখন তখন টুকিটাকি খাবার অভ্যাস দাঁতের সমস্যা ডেকে আনে। এখনো যেখানে (বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে) তৈরি করা খাবার (Ready to eat) সহজ লভ্য নয় সেখানে দাঁতের স্বাস্থ্য কিছুটা হলেও ভালো। একই সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকবেন এখনো যারা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকেন (বিশেষত আদিবাসীরা যারা বাজারের তৈরি করা খাবারের পরিবর্তে খুব সাম্প্রতিক কালেও বাড়িতে রান্না করা খাবার খেতে অভ্যস্ত ছিলেন) তাঁদের দাঁতের সমস্যা অনেক কম। একই কারণে 'সঠিক ভাবে' (বাবা-মায়ের ধারণায়) পরিচর্যা করা সত্ত্বেও আজকের শিশুদের দাঁতের রোগের বাড়বাড়ন্ত। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে পরিচর্যা করা দরকার সর্বক্ষণ। খাওয়ার পরে ঠিকমতো কুলকুচি করা এখন আর অপরিহার্য মনে করা হয় না। কারণ অনেকেই মনে করে থাকেন তাঁরা দিনে দুবার ব্রাশ করছেন এবং বাচ্চাদের করাচ্ছেন (পারলে শতাধিক টাকার টুথপেষ্ট দিয়ে) তাই যথেষ্ট। এই ধারণা অর্থহীন। সুস্থ দাঁত সুস্থ রাখতে হলে একটাই কথা মাথায় রাখা উচিত যে, দাঁতের প্রধান রোগ যে দন্তক্ষয় (দাঁতের পোকা বলে যা পরিচিত) তার সৃষ্টি দাঁতে লেগে থাকা খাদ্যকণিকা থেকে। যেহেতু জীবনধারণের জন্য খাবার খেতেই হবে, তাই এইটুকু মনে রাখতেই হবে যে, খাবারের বাসস্থান যেন মুখগহ্বর না হয়। কিন্তু এখন মানুষের (বিশেষত শিশুদের) খাদ্যাভ্যাস এমনই যে, খাবার দাঁতে লেগে থাকবেই। এখন চকোলেট, বিস্কুট, কেক এইসব খাবার শিশুদের নিত্যসঙ্গী। সুতরাং আরো একটি অবাঞ্ছিত সঙ্গীকে (দন্তক্ষয়) স্বীকার করতেই হবে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন তাদের শিশুদের মিষ্টি খাওয়ানো হয় না, তাও কেন দন্তক্ষয়? মিষ্টি খেলেই দন্তক্ষয় হবে, না খেলে হবে না এই ধারণা ভুল। মিষ্টি খেলেই দন্তক্ষয় হয় না, দন্তক্ষয় হয় খাবার দাঁতে লেগে থাকলে। তাই মিষ্টির থেকে কেক, বিস্কুট অনেক বেশি ক্ষতিকর। অথচ মহার্ঘ খাদ্য ভেবে অনেক মা-ই তাদের শিশুদের টিফিন বাক্সে কেক দেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো বড়দের চা খাওয়া (বিশেষত বিস্কুট সহযোগে) দাঁতের সর্বনাশের সহায়ক।

ক্ষতিকর যে খাদ্যের কথা বললাম সবগুলোই আঠালো (Sticky) ধরণের। এই আঠালো ধর্মের দরুণ এরা দাঁতের গায়ে লেগে থাকে এবং দন্তক্ষয় সৃষ্টি করে। এই ধরণের আঠালো খাবার এখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় তাই বারবার গৃহীত (ভক্ষিত) হয়। অথচ মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও এত রকমারি কেক, বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেট পাওয়া যেত না এবং মানুষকে রান্না করেই খাদ্যসংস্থান করতে হত। জলখাবার হিসাবে খাওয়া হত ফল, ফলজাতীয় কিছু আনাজ, মুড়ি ইত্যাদি। এখনো যদি চা, বিস্কুট, কেক বর্জন করে কেউ এইসব ফল বা আনাজ (শাঁক আলু, নাসপাতি, গাজর, মুলো ইত্যাদি) খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তাহলে তাঁর দাঁত অবশ্যই ভালো থাকবে। এইসব আঁশযুক্ত ফল খাওয়ার সময় ফলের আঁশ দাঁতের ময়লা (Plaque) পরিষ্কার করে দেয় এবং চিবানোর সময় মাড়ির মালিশ হয়। অর্থাৎ একেবারে Double function। অথচ এখনকার চিত্রটা দেখুন আমরা প্রত্যেকেই সকাল থেকেই Ready made food খাচ্ছি। মা তার শিশুকে প্রায়ই দিন, ভালো ভাবে চিবানোর দরকার নেই এমন খাবার (যা আবার আঠালো) টিফিন বাক্সে ভরে দিচ্ছেন। অনেকেই ভাবেন এইসব ঝামেলাহীন খাবার দামেও সস্তা পড়ে। মনে মনে হয়তো সেই মা ভাবছেন সকালেই তো ভালোভাবে ব্রাশ করিয়েছেন। অতএব ভাবনার কিছু নেই। এই ধারণা ভুল, দাঁত সকালে (হয়তো রাতেও) ব্রাশ করলেই সব হল না। দাঁত সর্বক্ষণ পরিষ্কার রাখতে হবে। একই সঙ্গে যোগান দিতে হবে (সম্ভব কি আজকের এই বিজ্ঞাপিত জগতে?) দন্ত বান্ধব (Tooth friendly) খাবার। অর্থাৎ আঁশযুক্ত খসখসে ফলজাতীয় খাবার। বন্ধ করতে হবে Ready made, Ready to eat জাতীয় খাবার। তবেই দন্তরোগ প্রতিরোধ সম্ভব হবে। বয়স্কদের চা, কফি (বিশেষত বিস্কুট সহযোগে) খাওয়ার অর্থ হলো দন্তক্ষয়ে সাহায্য করা। কারণ এইসব খাদ্যবস্তু দীর্ঘক্ষণ দাঁতের সঙ্গে লেগে থাকে। অতএব নিজেই ঠিক করুন কি করবেন। প্রসঙ্গক্রমে জানাই, আজকাল দেখছি কিছুমানুষ খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন দামী ব্রাশ এবং ততোধিক দামী টুথপেষ্ট ব্যবহার করে। ভেবে থাকেন তাঁরা বোধহয় দাঁতের রোগমুক্ত বলয়ে প্রবেশ করলেন। ভুল। দাঁত ভালো রাখে নিয়মিত ব্রাশ (দাঁতন) করার অভ্যাস, টুথপেষ্ট নয় (দামী বা নামী যাই হোক না কেন)। অবশ্য রোগাক্রান্ত দাঁতের জন্য কিছু নির্দিষ্ট Medicated Dental Cream ব্যবহারের বিধান আছে। কিন্তু সুস্থ দাঁত সুস্থ রাখতে চাই দাঁত সাফাই। আপনার দাঁত সুস্থ রাখবে আপনার হাতের ব্রাশ বা দাঁতন।

ডাঃ সিদ্ধার্থ শঙ্কর কুণ্ডু,
দন্ত চিকিৎসক

২০ মাইক্রনের ধোঁকা

দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ হঠাৎই একটা নির্দেশনামা জারি করেছেন যে ২০ মাইক্রনের নিচে প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ। অনেক পৌরসভাও এ নির্দেশ কার্যকর করার জন্য নিজ নিজ এলাকায় মাইকে করে প্রচার করেছেন। কিন্তু ২০ মাইক্রন প্ল্যাস্টিক ব্যবহার করলে মানুষের কি উপকার হবে তা বিস্তারিত আলোচনা নেই। ইতিমধ্যেই সরকারের সঙ্গে ইন্ডিয়ান প্ল্যাস্টিক ফেডারেশনের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে যে ব্যাগটি ২০ মাইক্রনের। একটা মজার থিয়োরী বের করেছেন প্ল্যাস্টিক ব্যাগ ব্যবসায়ীগণ। প্রথমত আপনি যে দোকান থেকে জিনিস কিনবেন সেইখানে আপনার সাথে বাজারের ব্যাগের পরিবর্তে একটা ফোল্ডিং দাঁড়িপাল্লা ও ৮০ গ্রাম থেকে ৯০০ গ্রামের বাটখারা নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া সঙ্গের চার্টটি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা থাকা অবশ্যই আবশ্যক। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মার্কিন রসায়নবিদ লিও বেকেল্যান্ড কৃত্রিম গালা বানাতে গিয়ে পৃথিবীর প্রথম প্ল্যাস্টিক তৈরি করে ফেলেন। ১৯০৯ সালে পেটেন্ট নেওয়ার সময় নিজের নামের অনুকরণে তিনি এর নাম দেন বেকেলাইট। এই শিল্পের বিপ্লব শুরু হয় তিরিশের দশকে যখন অ্যাক্রলিক, লাইলন, পলিস্টাইরিন আর পলিভাইনিল ক্লোরাইডের উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয়। এরপর থেকেই প্ল্যাস্টিক মানুষের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

১৯৯১ সালে ভারতে প্ল্যাস্টিকের মোট ব্যবহার ছিল ৯ লক্ষ টন। যার মধ্যে ৩৭.২ শতাংশ ছিল পুনর্ব্যবহৃত। এই হিসাব থেকে অনুমান করা যায় সেই সময়ই প্ল্যাস্টিক আবর্জনার পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ টনের মত। বর্তমানে আমাদের দেশে প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার দশ শতাংশ হারে বাড়ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্ল্যাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ টনের মত

এরপর ৬ এর পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

গুটিবসন্ত ভাইরাস ঘটিত রোগ। গুটিবসন্ত সব চেয়ে মারাত্মক। ডাঃ জেনার গুটিবসন্তের টীকা আবিষ্কার করেন। হামের জীবানু রুবেলা, ভাইরাস, জলবসন্তের জীবানু ভ্যারিসেলা ও গুটি বসন্তের জীবানু ভ্যারিওলা। জন্মাবার পর সাধারণ নিয়মে রোগ প্রতিরোধের জন্য তিন মাস বয়স থেকে মানুষের টীকা নেওয়া বাধ্যতামূলক। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে হাম, জলবসন্ত বা গুটিবসন্ত সেরে যায়। নিমের রস বা নিমের পাতার এই রোগকে উপশম করার বা সারিয়ে তোলার কোনও ক্ষমতা নেই। নিম একটা তেতো পদার্থ, সব ধরনের তেতোই পাকস্থলীকে উদ্দীপিত করে রস নিঃসরণে সাহায্য করে। তাই নিমপাতার রস খেলে খিদে বাড়তে পারে। নিমপাতার সঙ্গে জলবসন্তের ভালোমন্দের কোনও সম্পর্ক নেই।

ভাইরাস ঘটিত রোগে বা যে কোনও রোগেই আমাদের শরীরের ক্ষয় হয়। শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন শরীরের প্রয়োজন যথেষ্ট ক্যালরি ও প্রোটিনের। এক কথায় পুষ্টিকর খাদ্য চাই, যা সহজে হজম করা যায়। তাই তখন মাছ-মাংস-ডিম-দুধ এজাতীয় খাবার বেশি বেশি করে খাওয়া দরকার। (অবশ্য রান্না করতে হবে কম তেল মশলা দিয়ে)। তাই জলবসন্ত হলে 'মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া উচিৎ নয়, নিরামিষ খাওয়া উচিৎ' এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা।

শুভঙ্কর ঘোষ

২০ মাইক্রনের ধোঁকা

৫ পাতার পর

ব্যাগের মাপ	ব্যাগ / প্যাকেট	ব্যাগের ওজন হবে
৮ X ১০ ইঞ্চি	৫০টি	৮০ গ্রাম
৯ X ১২ ইঞ্চি	৫০টি	১১০ গ্রাম
১০ X ১৪ ইঞ্চি	৫০টি	১৬০ গ্রাম
১৩ X ১৬ ইঞ্চি	৫০টি	২২০ গ্রাম
১৬ X ২০ ইঞ্চি	৫০টি	৩৪০ গ্রাম
১৭ X ২৩ ইঞ্চি	৫০টি	৪৩০ গ্রাম
২০ X ২৬ ইঞ্চি	৫০টি	৫৬০ গ্রাম
২৪ X ৩০ ইঞ্চি	৫০টি	৭৮০ গ্রাম
২৭ X ৩০ ইঞ্চি	৫০টি	৯০০ গ্রাম

এবং তার মধ্যে ৪০ শতাংশ পুনর্ব্যবহৃত প্ল্যাস্টিক। বর্তমান প্ল্যাস্টিক আবর্জনার পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টন।

কেন্দ্রিয় সরকার একটি সমীক্ষা চালিয়ে রঙিন পলিব্যাগে খাবার বহন নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছে। রাজ্য সরকার সেই সুপারিশ রূপায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে বলেছেন, সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তাহলে মানুষ খাবার পরিবহনের জন্য কি করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেছেন, স্বচ্ছ পলিব্যাগে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে না। মানুষ সেগুলিই ব্যবহার করবেন। তাহলে ২০ মাইক্রন ব্যাপারটা কি? ২০ মাইক্রন সাদা প্ল্যাস্টিক ব্যবহার করলে সমস্ত সমস্যার অবসান হয়ে যাবে?

সমাধান কি?

আসলে মূল সমস্যা হল বিনা পয়সায় পাওয়া প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ। আমরা যা বিনামূল্যে পাই তা যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের একটা কু-অভ্যাস।

প্ল্যাস্টিক ব্যাগের মূল সমস্যা এটা মাটির সাথে মিশে যায় না বা রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু ইন্ডিয়ান প্ল্যাস্টিকস ফেডারেশন যে Recycling এর কথা বলেছেন তাও ঠিক নয়। কেননা এর মধ্যেই দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী বলেছেন থার্ড জেনারেশন প্ল্যাস্টিক থেকে ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা প্রকট। তাহলে Recycling করে আমরা ক্যান্সারকে আহ্বান করছি তার কারণ ভিনাইল ক্লোরাইড ক্যান্সারকে আহ্বান করে।

আসলে কোন কিছুকে নিষিদ্ধ করলেই তা বন্ধ হয়ে যায় এমনটা নয়। গরীব মানুষের প্ল্যাস্টিক ছাড়া গতি কি? প্ল্যাস্টিকের চটি, প্ল্যাস্টিকের বাটি, ছাতার বদলে প্লাস্টিক সেলাই করে মাথায় দিয়ে বাসন মাজা, প্ল্যাস্টিকের সারের বস্তা দিয়ে বাথরুম তৈরি বন্ধ করলে বা নিষিদ্ধ করলেই প্ল্যাস্টিক বন্ধ হবে এরকমটা ভাবা ঠিক নয়।

সমস্যার সমাধানের জন্য যা প্রয়োজন তা'হল জীবভঙ্গুর প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ। যে প্ল্যাস্টিক ব্যাগ খাবার বা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। শিল্প কর্মে ব্যবহারযোগ্য প্ল্যাস্টিক Recycling করলে খুব একটা অসুবিধা আপাতত নেই তবে সমস্ত ক্ষেত্রেই জীবভঙ্গুর প্ল্যাস্টিক ব্যবহার খুব জরুরী, কেননা সেই প্ল্যাস্টিক মাটির তলায় তাড়াতাড়ি মিশে

এরপর ৭ পাতায়

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

(এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে থাকবে লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কথা)

ভারতীয় শিয়াল বা পাতিশিয়াল (*Valpes bengalensis*): খুব ছোটবেলা থেকেই এই প্রাণীটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। গল্পে, রূপকথায় চতুর প্রাণী হিসাবে আমরা এর পরিচয় পেয়েছি। বাস্তবে ভারতীয় শিয়াল সত্যিই খুব চতুর প্রাণী। চাতুর্যের সঙ্গেই এই প্রাণীটি তার শত্রুকে ফাঁকি দেয় এবং শিকারকে কব্জা করে। এই প্রাণীটির গায়ের রং ধূসর, পা গুলি সরু, লেজের শেষ প্রান্ত কালো, কানগুলি ত্রিকোণাকার। এরা রাত্রে একা বা জোড় বেঁধে খাদ্যের সন্ধান করে এবং দিনের বেলায় ঝোপঝাড়ের

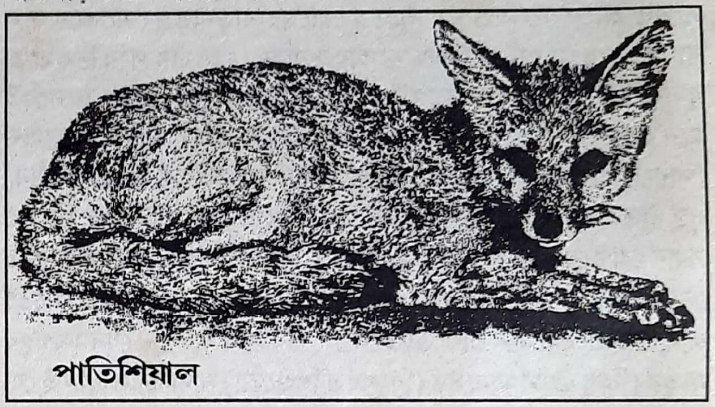

পাতিশিয়াল

আড়ালে বা গর্তে লুকিয়ে ঘুমোয়। এরা সাধারণত লোকালয়ের আশেপাশে ঝোপঝাড়ে বা চাষের জমির কাছাকাছি বসবাস করে। গায়ের বিশেষ গন্ধতেই এদের চেনা যায়। এরা বিশেষ সুরে রাত্রে ডাকে। এই ডাক ও গন্ধের মাধ্যমে এরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। এরা ইঁদুর, কাঁকড়া, উইপোকা, ছোটখাট গৃহপালিত প্রাণী বা হাঁস-মুরগী খায়। অনেক সময় এরা ফল ও খায়। লোকালয়ের দ্রুত বৃদ্ধি, চাষের জমিতে অত্যাধিক হারে কীটনাশকের প্রয়োগ, গৃহপালিত পশুপাখি রক্ষার জন্য মানুষের নির্দয় ব্যবহার এবং চামড়ার জন্য নির্বিচারে হত্যা—এইসব কারণে এদের সংখ্যা আজ দ্রুতহারে কমছে। ভবিষ্যতে এরা হয়ত কেবলমাত্র রূপকথাতে এবং বয়স্ক মানুষের স্মৃতিতেই থাকবে।

খেলতে খেলতে অঙ্ক

এসো আজকে একটা মজার খেলা খেলি! একটা বর্গক্ষেত্র নাও; এবার তাকে অনুভূমিক ও উল্লম্বদিকে তিনটি করে অংশে বিভক্ত করো। এবার বলতে হবে সৃষ্ট চিত্রে মোট বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা কটি।

এসো গুণে দেখি— ক) দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা 9টি আসলে এটি = সারি সংখ্যা X শ্রেণী সংখ্যা = 3 X 3

খ) ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা 4টি। পাশের চিত্রে দেখ একদম ওপরের সারি দুটো অধিকার করলে উক্ত আকারের বর্গক্ষেত্রের অবস্থান দুটো। ঠিক তেমনি ওপর-নীচের সরণ বিবেচনা করলে অবস্থান 2টি। অতএব, মোট অবস্থান (2 X 2)টি

গ) সর্ববৃহৎ বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা = 1টি।

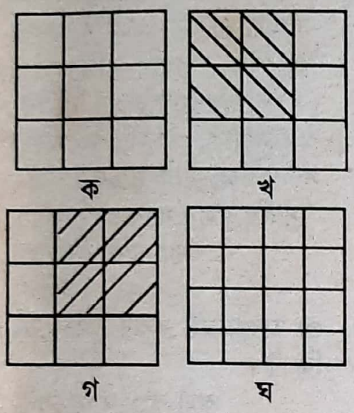

অতএব, মোট বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা = $(1^2+2^2+3^2) = 14$টি।

অনুরূপে, ঘ নং চিত্রের জন্য মোট বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা = $(1^2+2^2+3^2+4^2) = 30$টি।

এইরূপে বলা যায় যে, কোনও বর্গক্ষেত্রকে n টি সারি ও n টি শ্রেণীতে বিভক্ত করলে সেক্ষেত্রে মোট বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা= $(1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ টি (প্রমান পরে দেওয়া হবে)

লক্ষ্য কর 4টির ক্ষেত্রে n = 4। অতএব মোট বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা = $(1^2+2^2+3^2+4^2)$টি = $\frac{4(4+1)(2 \times 4+1)}{6}$ টি = $\frac{4 \times 5 \times 9}{6}$ টি = 30টি

এইভাবে নিজেরা করো আর গুণে পরীক্ষা করো গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ঐ হিসাবের সাহায্যে নির্ণয় করা সংখ্যাটি ঠিক কিনা।

শোভন বসু ২৪০৫-১১০৩

২০ মাইক্রন

৬ পাতার পর

যাবে। তাই সবার কাছে আবেদন—দাবি তুলুন জীবভঙ্গুর প্লাস্টিক তৈরির। বিদেশে প্লাস্টিকের ব্যাগের গায়ে লেখা থাকছে Please Reuse this Bag। এই কথাটা আমরাও লিখতে পারি। সমস্ত পৌর অঞ্চলে ও পঞ্চায়েত অঞ্চলে একটা করে বড় প্লাস্টিক আবর্জনা ফেলবার স্থান তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা শিবির (সরকারি ও বেসরকারিভাবে) করতে হবে।

আমরা কখনোই চাই না মাটির তলায় জমাকৃত প্লাস্টিক কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাক। অথবা একটা বড় ডলফিন খাবার ভেবে প্লাস্টিক খেয়ে মারা যাক।

বিবর্তন ভট্টাচার্য,
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।
৯৫৩৪৭৩ ২৪৩৩২৯

বিকল্প শক্তির সন্ধানে
বায়োগ্যাস

সম্প্রতি ভারত সরকারের অপ্রচলিত শক্তিমন্ত্রক (লোদি রোড, নয়াদিল্লী) শক্তির উৎস বিষয়ে একটি পুস্তিকা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। শক্তি সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে মানুষ যাতে কিছু ভাবতে পারেন বা করতে পারেন তার জন্য পুস্তিকাটির কয়েকটি পাতা পর্যায়ক্রমে ছাপা হবে। পাঠকদের মতামত জানাতে অনুরোধ করছি। —সম্পাদক

বায়োগ্যাস কি?

বায়োগ্যাস একটি দূষণমুক্ত জ্বালানী। এটা গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট নামেই বেশি প্রচলিত। সাধারণত কাঠ, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি যেসব পদার্থ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলির উচ্চমূল্য এবং সবসময় সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে এই বায়োগ্যাস বা জৈব গ্যাস প্রকল্প ক্রমশঃই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত এ রাজ্যে এক হাজারের বেশি বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে।

বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট কিভাবে তৈরি হয়- বড় একটা গর্ত অথবা চৌবাচ্চায় গোবর, শূকর, মুরগী, মানুষের মল, ফেলে দেওয়া শাক-সবজি ইত্যাদি পচিয়ে এই গ্যাস তৈরি হয়। একে তাই জৈব গ্যাসও বলে। এরমধ্যে মিথেন নামের সহজদাহ্য গ্যাসও থাকে। এই গ্যাসকে পাইপের মধ্য দিয়ে রান্নাঘরে বার্ণার জ্বালিয়ে রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়। বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট যা সাধারণত গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট নামে পরিচিত, সেই প্ল্যান্টে 'ডাইজেশন' প্রক্রিয়ায় এই গ্যাস গোবর, মানুষের মল ও অন্যান্য জৈব পদার্থ থেকে তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় গোবর ইত্যাদির উর্বরাশক্তিও বেড়ে যায়।

প্রতিদিন অন্ততঃ ২০ থেকে ২৫ কেজি জৈব পদার্থ প্রয়োজন। বাড়ীতে ২টো বা ৩টে গরু-মহিষ থাকলে তার গোবরেই একটি প্ল্যান্ট বসিয়ে গোবর গ্যাস পাওয়া যেতে পারে।

যেসব সুবিধা পাওয়া যায়—১) তাপ বেশি থাকায় রান্না তাড়াতাড়ি হয়, ফলে বাড়ীর মেয়েরা অন্যদিকে অনেকটা সময় দিতে পারেন। ২) ধোঁয়াহীন বলে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সাথে সাথে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। ৩) কাঠের ব্যবহার না হওয়ার ফলে জঙ্গলের গাছপালার ক্ষতি হয় না, তাতে পরিবেশের ভারসাম্য থাকে। ৪) এই গ্যাসের সাহায্যে বিশেষ নিয়মে উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায় আর অনেকটা করে তৈরি করতে পারলে পাম্পসেটও চালানো যেতে পারে। ডুয়েল ফ্যুয়েল ইঞ্জিন চালানো যায়। ৫) এই প্ল্যান্ট থেকে একই সাথে রান্নার গ্যাস এবং গোবর থেকে তৈরি অত্যন্ত উর্বর সার পাওয়া যায়। এই সার মাছের অত্যন্ত মূল্যবান খাবার। ৬) এছাড়া স্যানিটারী পায়খানার সঙ্গে যুক্ত করে দিলে পায়খানা জীবানুমুক্ত ও পরিষ্কার থাকে তাছাড়া মল সারে পরিণত হয়।

বায়ো গ্যাস তৈরি করতে গেলে যা যা দরকার- ১) গোবর, ফেলে দেওয়া শাক-সবজি, সবজির খোসা, হাঁস, মুরগী, গরু, মানুষের মল এবং এগুলিকে পচাবার জন্য একটা চৌবাচ্চা। ২) একটি ডাইজেস্টর বা পচন আধার। ৩) একটি গ্যাস হোল্ডার বা গ্যাস তৈরি হয়ে যেখানে জমা থাকবে সেরকম একটি চৌবাচ্চা। ৪) প্ল্যান্টে যে গ্যাস তৈরি হচ্ছে সেটা বেরোবার জন্য একটি পাইপ। ৫) এছাড়া একটি গ্যাস স্টোভ।

বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট বসানো এবং সেগুলোর দেখাশোনার জন্য সরকার থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্ল্যান্ট বসাতে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা শিল্পকেন্দ্রের মাধ্যমে আবেদন জানাতে হবে।

প্রচুর সংখ্যায় এই প্ল্যান্ট বসানো গেলে গ্রামের বেকার ছেলেমেয়েদের সরকারী প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছুটা কর্মসংস্থানেরও বন্দোবস্ত করা যেতেপারে। বায়োগ্যাস নির্মাণ প্রকল্পে ওয়েবরেডার (W.B.R.E.D.A) সাহায্য পাওয়া যায়।

Declaration No. 28/JM dt. 23.6.2003 (From Office of the District Magistrate, North 24 Pgs J.M Department), Barasat. Vide Memo No. 714(4)/ J.M. Dated. 30.6.03.

কৌতূহল

এই বিভাগে নিয়মিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রশ্ন প্রকাশকের কাছে পাঠাতে পারে। নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। আমরা যথাসম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

(ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নগুলি অপরিবর্তিত ভাবে ছাপানো হল)

প্রঃ গঙ্গী নদীতে ব-দ্বীপ কেন তৈরী হচ্ছে?

ছাত্র-ছাত্রী অষ্টম শ্রেণী
হালিশহর বারুইপাড়া
হাই স্কুল।

উঃ গঙ্গী নদীতে ব-দ্বীপ গঠিত হয়—

নদীর নিম্নপ্রবাহে ভূমির ঢাল যথেষ্ট কম হওয়ার জন্য নদী তার প্রবাহপথে সামান্য পরিমাণ বাধা পেলে সেই অংশে পলি, বালি, নুড়ি, কাঁকড় ইত্যাদি সঞ্চয় করতে থাকে। গ্রীক অক্ষর ডেল্টা-র ন্যায় মাত্রাহীন 'ব' আকৃতির এই বিশেষ ধরণের ভূমিরূপকে ব-দ্বীপ বলে। নদী মোহনার আকৃতি, ভূমির ঢাল, নদীর সঞ্চয়ের প্রকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে ব-দ্বীপের গঠন বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন: ত্রিকোণাকৃতি ব-দ্বীপ, পাখির পায়ের ন্যায় ব-দ্বীপ, হ্রদ ব-দ্বীপ ইত্যাদি।

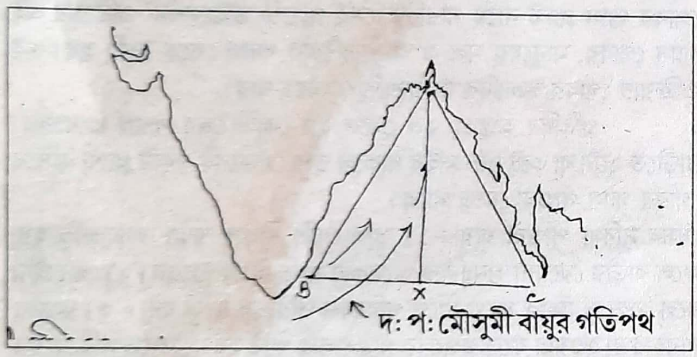

দ: প: মৌসুমী বায়ুর গতিপথ

গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপ ত্রিকোণাকৃতি ব-দ্বীপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রধানত: মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের কাছে গঙ্গার প্রধান শাখানদী ভাগীরথী, হুগলী এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার মূল ধারাটির সমন্বয়ে এই ব-দ্বীপ গঠিত হয়েছে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সৃষ্টির কারণগুলি নিম্নরূপ—

(১) বিপরীত বায়ুপ্রবাহ: নদী প্রবাহের বিপরীত দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হলে নদীর মোহনা অংশে পলির সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ত্রিভুজের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বঙ্গোপসাগরের তিনদিক স্থলবেষ্টিত এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এই ত্রিভুজের 'AX' অক্ষ বরাবর প্রবাহিত হয়। ফলে এই অংশ দিয়ে প্রবাহিত সমুদ্রবায়ুর তীব্রতা সর্বাপেক্ষা অধিক। ফলে ইহা বিপরীত দিক থেকে আগত গঙ্গার পলি সঞ্চয়ে সহায়তা করে।

(২) পলি সঞ্চয়ের মাত্রা: গঙ্গা ভারতের একটি আদর্শ নদী। ফলে উচ্চ ও মধ্যগতিতে ক্ষয়ীভূত বিপুল পরিমাণ পলিরাশি এর নিম্নগতিতে সঞ্চিত হতে থাকে এবং সঞ্চয়ের মাত্রা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মূল গঙ্গা নদী পদ্মা ও ভাগীরথী নামে দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যায় এবং সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নদীর নিম্নপ্রবার অভিমুখে ব-দ্বীপের গঠনও বৃদ্ধি পায়।

(৩) মহীসোপানের বিস্তার: গঙ্গার মোহনামুক্ত অংশে মহীসোপানটি যথেষ্ট বিস্তৃত, ফলে ভূমির ঢাল খুবই কম। তাই সমুদ্র স্রোতের অপসারণ ক্ষমতা অপেক্ষা নদীর সঞ্চয়ের হার অধিক।

(৪) লবনতার মাত্রা: বঙ্গোপসাগর প্রধানত: ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্র হওয়ায় সূর্যের তাপে বাষ্পীভবনের হার অধিক হয় বলে এর জলরাশির ঘনত্ব বেশি। ফলে ইহা সংলগ্ন মোহনাযুক্ত অংশে পলির সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

এইভাবে প্রধানত: গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হিসাবে গঠিত হয়েছে।

অনিন্দ্য চক্রবর্তী,(শিক্ষক),
শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র
হাইস্কুল।

প্রঃ গঙ্গা দূষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় গুলি কি কি?

ঝুমা কুণ্ডু, নবম শ্রেণী,
হালিশহর বারুইপাড়া
হাইস্কুল।

উঃ গঙ্গা দূষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়গুলি হল—

(১) কলকারখানা থেকে দূষিত জল গঙ্গায় না ফেলা বা দূষিত জল পরিশ্রুত করে গঙ্গায় ফেলা। (২) গঙ্গার তীরবর্তী সব শহরের পরিত্যক্ত নোংরা জল সরাসরি গঙ্গায় না ফেলে Water Treatment Plant এর মাধ্যমে পরিশ্রুত করে গঙ্গায় ফেলা। (৩) পলিথিন জাতীয় পদার্থ, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগ, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক বৃষ্টির জলের সাথে গঙ্গায় এসে জমা হয়। এই সব পদার্থের যথেচ্ছ ব্যবহার না করা এবং জৈবভঙ্গুর পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি করা। (৪) গঙ্গার গুরুত্ব (সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে) সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা।

সঞ্চয় কুমার সরকার (শিক্ষক),
শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র
হাইস্কুল।

প্রঃ অরণ্য নষ্ট করার কুফলগুলি কি কি?

ঝুমা কুণ্ডু, নবম শ্রেণী,
হালিশহর বারুইপাড়া
হাইস্কুল।

উঃ অরণ্য নষ্ট করার কুফলগুলি হল—

১) বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য ব্যাহত হবে। ২) বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ নষ্ট হবে ও লুপ্ত হবে। ৩) জ্বালানী কাঠের অভাব দেখা দেবে। ৪) কাগজ শিল্প, দিয়াশলাই শিল্পের মতো অনেক শিল্পের অবলুপ্তি ঘটবে। ৫) বৃষ্টিপাতের হার অরণ্যের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। অরণ্য কমলে বৃষ্টিপাত কমবে। ৬) বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থান নষ্ট হওয়ার দরুণ তারা লুপ্ত হবে। ফলে পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হবে।

৭) ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে।

সঞ্চয় কুমার সরকার (শিক্ষক),
শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র
হাইস্কুল।

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব বিজ্ঞান দরবার সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত। সম্পাদক মণ্ডলী— প্রতুলকুমার দাস, দীপক মজুমদার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস ও সুজয় বিশ্বাস (বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে)। ফোন - ২৫৮৫ ৬০৩২, ২৮৭৬ ০৭২০, ২৫৮৮ ০৮২১, ২৫৮৭ ৬২৭৫

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার।